উদারনৈতিক অর্থনীতি— একটি পর্যবেক্ষণ

রথিন চক্রবর্তী

সম্প্রতি ২৫শে মে, ২০১৩ সালে, ভারতের এক অঙ্গরাজ্য ছত্তিশগড়ে ভারতের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল, কংগ্রেসের একটি নেতৃত্বমূলক দল যখন পার্বত্য জঙ্গলময় পথ দিয়ে গাড়িতে যাচ্ছিলেন তখন তাদের ওপর এক হামলা হয়। বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণে একাধিক নেতা কর্মী নিহত হলেন। বোঝা গেল পরিকল্পিতভাবে একদল মানুষ এই দল এবং তাঁদের অনুগামীদের নিহত করার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালিয়েছিল। আর যারা তা করেছে তারা সাধারণ্যে মাওবাদী বলে পরিচিত।

এই ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হল ভারতের প্রধান শাসকদলের প্রতি একদল মানুষের এত ক্ষোভ যে তারা সেই শাসকদলকে যে কোনও ভাবে আঘাত করতে প্রস্তুত।

এটা পৃথিবীর অনেক দেশেই ঘটছে, কোথাও সংগঠিতভাবে, কোথাও বা অসংগঠিতভাবে। কারণটা অন্বেষণ করতে গেলে দেখা যাবে মূলে রয়েছে বৈষম্য ও অবিচার। সমবিচার ও সমদর্শিতার অভাব এইরকম বিস্ফোরণমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

এই বৈষম্যটা সেই চিরকালীন Haves এবং Have nots-এর। যাদের আছে আর যাদের নেই তাদের মধ্যেই। সব 'আছেওয়ালা'দের বিরুদ্ধেই কিন্তু সব 'নেইওয়ালারা' সকল সময়ে ক্ষুব্ধ হয় না। মেদিনীপুরের গ্রামের মণি ভৌমিক যখন 'আছেওয়ালাদের' দলে ঢুকে পড়েন তখন গ্রামের 'নেইওয়ালারা' ক্ষুব্ধ হন না। বরং গর্বিত হন। কিন্তু যখন কোনো এক সমাজবিরোধী নানা রকম অবৈধ পথে সমৃদ্ধ হয় তখন প্রতিবেশীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকেন, তার বিরুদ্ধে মুখ খোলেন।

ভারতের সাম্প্রতিক যুগের এই 'আছেওয়ালা' ও তাদের রাজনৈতিক রক্ষকদের দেশবাসী সমাজবিরোধী বলেই মনে করেছে। তাই তারা ক্ষুব্ধ। মাওবাদীরা তাদের এক উগ্র ও নিষ্ঠুর সংস্করণ। পেছনে হয়তো অন্য কোনো শক্তি থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু মূল ব্যাপারটা আছেই। তা হল ক্ষোভ। মাওবাদীরা পুষ্টি ও যোগান পায় অন্য কোথাও থেকে কিন্তু আশ্রয় পায় দরিদ্র আদিবাসী জনসমাজের মধ্যে যারা যুগ যুগান্ত ধরে অবহেলিত, বঞ্চিত এবং অনেকাংশে নিপীড়িত এবং বর্তমানে আক্রান্ত।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে শাসককুল এই নিচু তলার মানুষ নিয়ে কিছু ভাবেনি। তাদেরও তখন অত পাহাড় জঙ্গলে ঢোকার প্রয়োজন পড়েনি। পাহাড় জঙ্গলের বাইরেই তাদের অনেক লুঠের সম্পদ ছিল। আর পাহাড় জঙ্গল লুঠ করার অত যান্ত্রিক কৌশলও তখন তাদের আয়ত্ত হয়নি। সুতরাং পাহাড় জঙ্গলের আদিবাসীরা তখন সাহেব বা তাদের দালালদের না মারলে শাসকরা তাদের ঘাঁটাতে যেত না। তারা তাদের মত বেঁচে থাকত।

সেই বিদেশি ইংরেজ শাসকদের জায়গায় আমাদের দেশীয় শাসক যাঁরা এলেন তাঁরা যে পদ্ধতিটার মধ্যে দিয়ে এলেন সে পদ্ধতিটার নাম হল transfer of power। অর্থাৎ যে power-টা বিদেশিদের হাতে ছিল সেই power-টা শুধু হস্তান্তরিত হয়ে গেল। Transformation of outlook বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কোন ব্যাপার সেখানে থাকেনি। দেশবাসীর বিভিন্ন অংশকে সেই বিদেশিরা যে চোখে দেখত এবং বিচার করত, এই হস্তান্তর-প্রাপ্ত শাসকরাও সেই একই চোখে তাদের দেখতে শুরু করে।

পরিবর্তন শুধু দুটো জায়গায় হয়। এক সাদা চামড়ার রাজনীতিকদের জায়গায় বাদামি চামড়ার রাজনীতিকরা আসেন। আর, দুই, সাদা পুঁজিপতিদের জায়গায় বাদামি পুঁজিপতিরা আসেন। অর্থনীতি ও সমাজনীতির বাকি কাঠামো প্রায় একই থাকে। অর্থাৎ দেশবাসীর সম্পদ দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীতে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এই দেশীয় পুঁজিপতিদের সম্পদ বাড়ানোর অনেক নতুন নতুন এলাকা আবিষ্কৃত হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে সব থেকে বড় এক এলাকা রয়েছে মাটির নিচে; আর তা সৌভাগ্যক্রমে শহর বা নগর এলাকার বাইরে— পাহাড় জঙ্গলে। সে সব সম্পদ তুলে বা উঠিয়ে তাকে যেমন কাজে লাগানো যায় তেমনি বিক্রিও করা যায় এবং তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। স্বাধীনতার পর ঠিক হয়েছিল যন্ত্রপাতি কিনে এনে বা তৈরি করে তা রাষ্ট্র নিজেই করবে। পরে রাষ্ট্রনেতারা ঠিক করলেন, না, রাষ্ট্র নয় পুঁজিপতিরা নিজেরাই করুক। রাষ্ট্র তাদের কাছ থেকে উৎপাদিত সামগ্রী কিনে নেবে। দামটা ওরাই ঠিক করবে। কেন না উদারনৈতিক অর্থনৈতিক সূত্র অনুযায়ী ওরাই তো বুঝতে পারবে সব মিলিয়ে ওই ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীর কত দাম পড়ল।

এই অর্থনীতি এখন ভারতে অনুসৃত হচ্ছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন কিছু পুঁজিপতির হাতে ছেড়ে দেওয়া আছে মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর গুণমান এবং মূল্যমান। দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাটা খুব খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু ভারতীয় চরিত্রের যে বাস্তব চিত্রটি পাওয়া যায় তা পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশে বিরল। দুধে, শিশুখাদ্যে, ঔষধে ভেজাল— এ সব তো ইওরোপ, আমেরিকা, জাপানে কোথাও পাওয়া যাবে না, ভারতে পাওয়া যাবে। সাম্প্রতিক উদাহরণ— র‍্যানব্যাক্সি। ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্রুত সম্পদবৃদ্ধির এই অনিয়ন্ত্রিত লাগামছাড়া উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা ভারতের স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী যুগে এত বীভৎসভাবে প্রকট হয়নি। প্রকট হতে আরম্ভ করে বিগত শতাব্দীর নব্বই-এর দশক থেকেই।

১৯৯১-তে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর বিশ্বের অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশও যেমন এক অনিয়ন্ত্রিত মুনাফা বৃদ্ধির পথে যাত্রা করল ভারতও

তেমনি এগোল। পশ্চিমী পুঁজিবাদ জানাল সমাজতন্ত্রের থেকে ভাল ও গণতান্ত্রিক এক ওয়েলফেয়ার ইকনমির মধ্যে দিয়ে যাত্রা করে তারা জনকল্যাণ ও সমৃদ্ধি দুটোই সম্পন্ন করবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদীদের সামনে এক প্রশ্রয়ের পথ খুলে দিল। উদারীকরণ নামের আড়ালে তাঁদের স্বেচ্ছাতন্ত্রের পথে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হল।

তবে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর ধনতান্ত্রিক বিশ্বকে যত উচ্চকণ্ঠে বলতে শোনা গিয়েছিল যে গণতন্ত্রহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার থেকে গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্র বা ওয়েলফেয়ার ইকনমির সমাজব্যবস্থা অনেক ভাল ও কল্যাণকর, আজ আর তাঁরা তা বলতে পারছেন না। ফ্রি ইকনমি বা মুক্ত অর্থনীতিকে প্রসারিত হতে দিয়ে কার্যত তাঁরা আজ অনিয়ন্ত্রিত এক স্বেচ্ছাচারী অর্থনীতিকে আসবার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই অর্থনীতির দাপট এখন প্রায় সারা দুনিয়ায়,— বিশেষ করে পশ্চিমী দুনিয়ায়। আর তার গ্রাসে আজ ভারতও।

এই স্বেচ্ছাচারী অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিকে ওই নামে ডাকলে বড় খারাপ শোনায়, তাই বলা হয়েছে উদারনৈতিক মুক্ত অর্থনীতি। এই নীতি অনুসৃত হলে বিনিয়োগকারীরা নাকি সুস্থ ও গঠনমূলক প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে দেশের সমৃদ্ধি ঘটাবেন, বিশ্ব বাণিজ্যে এক সমৃদ্ধির জোয়ার আনবেন। শিল্পপতি বা বিনিয়োগকারীদের বলে দেওয়া হল তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতো শিল্প গড়বে, উৎপাদন করবে। রাষ্ট্র বা দেশের প্রয়োজনে নয়, তোমাদের নিজেদের যাতে লাভ হয় সেই রকম শিল্প গড়বে এবং তার বিক্রয়মূল্যও তোমরাই তোমাদের ইচ্ছে মতো ধার্য করবে। রাষ্ট্র সেখানে কোনও নিয়ন্ত্রণ চাপাবে না। এইটেই হল গণতান্ত্রিক অর্থনীতি। এইটেই হল উদারনীতি।

কিন্তু ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিষকে তো পরিহার করা যায় না। তা যথা নিয়মেই ফুটে উঠতে লাগল। এই তথাকথিত উদারনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে দিয়ে সম্পদ ক্রমেই কিছু মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি, অসাধু আমলা ও রাজনীতিকদের হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল। আমেরিকায় তা হয়ে গেল ২ পারসেন্ট বনাম ৯৮ পারসেন্ট, ভারতে ১৩টি পরিবারের হাতে পুঞ্জীভূত হল দেশের সম্পদের ৫৩ শতাংশ। সমাজের মানুষের মধ্যে বর্ণবৈষম্য ও জীবনভোগের মানের ব্যাপক তারতম্য ঘটে যেতে শুরু করল। আর সেই সঙ্গে বাড়তে লাগলো দুর্নীতি। মানুষের নৈতিক চরিত্রের ঘটতে লাগল ক্রম অধঃপতন।

পশ্চিমী অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণাধীন দুনিয়ায় এর ফলে বেড়েছে অনাহার, বেকারি ও অপরাধপ্রবণতা, চিরশোষিত আফ্রিকার— বিশেষ করে মধ্য আফ্রিকার চাদ, নাইজার প্রমুখ দেশে— এদের কথা বাদ দিলেও দক্ষিণ ইওরোপের স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, গ্রিস ইত্যাদি দেশগুলোর অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক চেহারা দেখলে এই ওয়েলফেয়ার ইকনমির প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত হবে।

এই পরিস্থিতিতে তথাকথিত উদারনৈতিক অর্থনীতির প্রবক্তারাও আজও কিছুটা আতঙ্কিত। অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিপতির দল যেভাবে সম্পদকে ক্রমান্বয়ে কিছু মুষ্টিমেয়র হাতে পুঞ্জীভূত করেছেন, এবং যেভাবে বৃহত্তর জনসমাজ ক্রমেই গভীর সঙ্কটের আবর্তে পড়ে

যাচ্ছে তা দেখে এই পশ্চিমী ধনকুবেরের একাংশ একটা কিছু নতুন পথ বার করা যায় কিনা ভাবতে চেষ্টা করেছেন। Corporate Social Responsibility (CSR) তাঁদের নতুন তত্ত্ব। অর্থাৎ Corporate House-গুলিকে কিছু সামাজিক দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। তাঁদের বিশাল অনিয়ন্ত্রিত লভ্যাংশের কিছুটা সামাজিক কাজ কর্মে ব্যয় করতে হবে। ২০০২ সালে World Economic Forum এ বিল গেটস বলেছিলেন, "We need a discussion about whether the rich world is giving back what it should to the developing world."

সেদিন তিনি উন্নয়নশীল দেশের কথা উল্লেখ করেছিলেন। দরিদ্র দেশের কথা বা দারিদ্র্য প্রসঙ্গে কিছু বলেননি। আজ দশ বছর পরে কিন্তু সেই বিখ্যাত ধনকুবেরদের প্রতিনিধি, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম (Jim Yong Kim) বলতে বাধ্য হচ্ছেন, "We are no longer dreaming of a world free of poverty. We have set an expiration date for extreme poverty" প্রচণ্ড দারিদ্র্য আছে। সেই প্রচণ্ডতা খানিকটা কমার আশা করেছেন। সময় সীমাও মোটামুটি ধার্য করেছেন— ২০৩০। তাঁর হিসেবে "there are still 1.2 billion (একশ কুড়ি কোটি) people living in extreme poverty" আর তাঁর এই extreme poverty দূরীকরণের আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে হলে তাঁর কথায়, "The goal of shared prosperity... will not be achieved without addressing inequality."

অর্থাৎ Corporate Social Responsibility ভাবার পরেও এই ২০১৩-র এপ্রিলে তাঁকে বলতে হচ্ছে "without addressing inequality" এই extreme poverty দূর করা যাবে না।

কিন্তু এই বৈষম্যকে (inequality) কিভাবে মোকাবিলা করা হবে? একটা পথ তো খোঁজা হচ্ছে Corporate Social Responsibility-র মধ্যে দিয়ে। বলা হয়েছে "CSR is about corporation being asked to provide public goods – roads, healthcare or education – when governments are unwilling or unable to provide these goods at the behest of their citizenry," (Dr. Susan Ariel Aaronson to Lara Choksey in an interview – The Statesman, 26/ 1/ 2013). কিন্তু পশ্চিমী পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এই অন্বেষণ যে খুব সুফলদায়ী হচ্ছে না তার প্রমাণ যেমন টু পারসেন্ট নাইনটি এইট পারসেন্টে বিভক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই, তেমনি বা তার থেকেও ভয়াবহরূপে প্রকটিত, দক্ষিণ ইওরোপীয় দেশগুলিতে। স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, গ্রীস, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে। ভয়াবহ বেকারি, নিরাপত্তাহীনতা এমনকি অর্দ্ধাহারে জর্জরিত সে সব দেশ। সেখানকার শিল্পপতিরা বা তাদের রক্ষাকর্তা শাসককুল এখন দিশাহারা।

এই ঢেউ-এ ভারতও প্রায় বিপর্যস্ত। World Bank সমীক্ষা বলেছে — "India accounts for one third of the global poor. (Statesman, 22/ 4/ 2013)। ওঁদের যে মানদণ্ডে এই দারিদ্র্য নির্ধারিত, ভারত তার থেকেও নিচে। ওঁদের মানদণ্ডে ১.২৫ ডলারের নিচের দৈনিক আয়সম্পন্ন মানুষ দরিদ্র। অর্থাৎ ভারতে তার হিসেবে হবে প্রায় ৭৩/৭৪ টাকা, কিন্তু অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির সমীক্ষা বলে ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় ২৭ টাকার কাছাকাছি।

যাই হোক, এই চিত্র সত্ত্বেও ভারতও CSR-এর পথ ধরার চেষ্টা করেছে। ২০১২ সালে একটা Companies Bill পাশ করে জানাল যে, যে কোম্পানির মোট মূলধন ৫০০ কোটি বা তার বেশি অথবা যাদের নিট লাভ পাঁচ কোটি বা তার বেশি, তাদের মূল লাভের অন্তত দুই শতাংশ এই কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি খাতে ব্যয় করতে হবে।

কিন্তু প্রশ্নটা হল শিল্পপতিরা কোন পদ্ধতিতে এই ব্যয়টা বহন করবেন। তাঁরা কি কর হিসেবে এই দুই শতাংশটা সরকারকে দেবেন, না নিজ পছন্দমত এনজিও মারফত এটা বন্টন করবেন। এই প্রশ্নের কোনো পরিষ্কার উত্তর সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয়নি। কর বা ট্যাক্স যে শিল্পপতিরা এড়িয়ে যেতে চান তার তো অজস্র প্রমাণ আছে। আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের Elliott School of International Studies-এর এ্যাসোসিয়েট রিসার্চ প্রফেসার এবং National War College-এর মিনার্ভা চেয়ার পদের অধিকারিনী Dr. Susan Ariel Aaronson এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি জানিয়েছেন এই বড় বড় ব্যবসায়ী সংস্থা বা Corporation-গুলো সাধারণত ট্যাক্স দিতে চায় না। "These corporations constantly avoid their taxes through tax shelters, and they lobby to have tax breaks" তাছাড়া এই সব সংস্থাগুলো অনেক ক্ষেত্রে এত শক্তিশালী যে তারা সরকারকে পরোয়াই করে না। "it is true that in countries where business (class) is extremely powerful, particularly in mineral – rich countries, one or two firms might have too much influence over government policy." (Aaronsen)

সুতরাং এই কর আদায় প্রক্রিয়া খুবই কঠিন, বিশেষত ভারতের ক্ষেত্রে যেখানে Reliance বা টাটাদের মত সংস্থাগুলোর নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী বদল করা হয়।

দ্বিতীয় বিকল্প থাকে এনজিও মারফৎ এই CSR সংগ্রহ। কিন্তু তাও যে অবাস্তব প্রক্রিয়া তাও শ্রীমতী আরুনসন স্বীকার করেছেন। কারণ কোন্ এনজিওরা কোন্ সংস্থার CSR সংগ্রহ করবে তা কে ঠিক করবে। এবং তা করলেও সেই অর্থ নির্দিষ্ট প্রকল্পে ব্যয়িত না হয়ে আবার সেই corporate সংস্থার হাতেই ফিরে যাবে না তো? সেই transparency বা স্বচ্ছতা কোথায়।

শ্রীমতী আরুনসন এই সমস্যা নিরসনে একটা সাজেশান দিয়েছেন, বিশেষ করে Extractive Industries-এর জন্য। তাঁর মতে Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)-এর মাধ্যমে যদি government, business এবং civil society-র মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও স্বচ্ছতার সঙ্গে তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় তাহলে এই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ঠিক পালিত হচ্ছে কিনা তা ধরা যেতে পারে।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ভারতে এটা দুরাশা। তিনি যে প্রত্যাশা করেন যে, যেসব সংস্থা দেশের খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ব্যবসা করেন তারা সিভিল সোসাইটিকে জানাবেন তারা কত মূল্যের সম্পদ উত্তোলন করলেন, আর সরকার কত মূল্য পেলেন তা নেহাৎ-ই কল্পনা।

একটা বিশেষ সংস্থার কার্যকলাপ ও তার মুখোমুখি ভারত সরকারের ভূমিকা যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে ভারতের মাটির নিচের সম্পদ কিভাবে একটা

প্রাইভেট কোম্পানিকে লুট করতে দিচ্ছে ভারত সরকার।

প্রকৃতিক ভূগর্ভস্থ গ্যাস বা তেল একটা দেশের সম্পদ। বিধিসম্মতভাবে এই সম্পদের মালিক সমগ্র দেশবাসী। এই গ্যাস বা তেল উত্তোলন করে তা ব্যবহার করা হলে তার সুফল যেমন সমগ্র দেশবাসীর পাওয়া উচিত, তেমনি সেই সম্পদের বাণিজ্যিক লভ্যাংশও আনুপাতিক হারে দেশবাসীর প্রাপ্য।

ইংরেজ আমলেই ভারতের আসামে প্রথম তেলের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তার উত্তোলন প্রক্রিয়া ও ব্যবহার শুরু হয়। স্বাধীন ভারতে মুম্বই সন্নিহিত আরব সাগরে আরও তেলের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং Bombay High নামক মঞ্চ গড়ে তুলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে তেল তোলা হতে থাকে। এই খনিজ গ্যাস তেল প্রভৃতির Source আবিষ্কার বা উত্তোলন প্রক্রিয়ার জন্য গড়ে তোলা হয় ONGC বা অয়েল এ্যান্ড ন্যাচরল গ্যাস করপোরেশন নামক রাষ্ট্রীয় সংস্থা। এই সংস্থাই ১৯৮৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা-গোদাবরী নদীর অববাহিকা অঞ্চল— যা কেজি বেসিন নামে পরিচিত সেখানে খুঁজে পায় এক বিশাল প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের ভান্ডার-ভূমি। খুঁজে পাওয়ার পর কিন্তু ONGC-কে ওখানে আর কাজ এগোতে দেওয়া হয়নি। ভারত সরকার নির্দেশ দিয়ে সে কাজ বন্ধ রাখেন। কেন বন্ধ রাখেন তার কোনও উপযুক্ত কারণ দেশবাসীকে জানানো হয়নি। তখন ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন শাসন ক্ষমতায়। সিদ্ধান্ত তিনি প্রায় একাই নিতেন। অনুমান করা হয়, ভারত জ্বালানীতে স্বনির্ভর হয়ে গেলে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর এত বড় ব্যাপারটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের চাপেই হোক বা উৎকোচের লোভেই হোক ভারত ওদের কাছ থেকে তেল কেনা বজায় রাখল এবং ওই বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তির পুনর্নবীকরণ করল। Normal discount ও কমিশনে প্রচুর টাকা ব্যক্তিগত অথবা দলগত তহবিলে জমা পড়ল।

এরপর বেশ কয়েক বছর এ ব্যাপারে স্থিতাবস্থা বজায় থাকার পর ২০০২ সালে আবার কে জি ওয়ান বেসিনের দিকে নজর পড়ল। কেন্দ্রে তখন বিজেপি সরকার। এবার কিন্তু আর ওই সরকারি সংস্থা ONGC-কে দায়িত্ব দেওয়া হল না। প্রাইভেট সেক্টরের হাতে ব্যাপারটি তুলে দেওয়া হল। নিলাম ডাকা হল। একমাত্র টেন্ডারদাতা Reliance Petroleum ডাক পেল। শোনা যায় সরকারি বেসরকারি সব রকম শক্তিপ্রয়োগের ফলে আর কেউই টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

১৯৬৭ সালে ধীরুভাই আম্বানির দুবাইতে ছিল এক ইলেকট্রনিক্স গুডস-এর ব্যবসা। তাঁর নানা যোগ্যতা ও চতুরতার কারণে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর জীবনকালেই তিনি ভারতীয় পলিয়েষ্টার বস্ত্র শিল্পে প্রভূত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। সুতরাং এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে তাঁর কোম্পানিই ভারতের মাটির নিচের সম্পদের ব্যবসায় অগ্রাধিকার পাবেন। অরুন্ধতী রায় তাঁর রচনা, "Capitalism: A Ghost Story"-তে সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন, "Here we are" the friend who took me there said," pay your respects to our new Ruler" বাস্তবিকই এই new Ruler আর কেউ নন, তিনি হলেন মুকেশ আম্বানি। যে বাড়িটার সামনে শ্রীমতী রায়কে তাঁর বন্ধু এই কথাটি বলেছিলেন সে বাড়িটির নাম "Antilla"— মুম্বাই এর

আল্টামন্ট রোডের ওপরে ১১ লক্ষ স্কোয়্যার ফিটের তিনটে হেলিপ্যাড সমন্বিত ২৭ তলা বাড়ি। ভারতের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি।

ধনীদের নিজেদের কোনও রাজনৈতিক দল থাকে না। যে দলকে ভালো দাস হিসেবে পায় সেইটিই তখন তার দল। উত্থান ইন্দিরা গান্ধীতে। বিকাশ বাজপেয়ীতে। বাজপেয়ী সরকার থেকেই Reliance Petrochemicals পেল KG Basin-এর গ্যাস ও তেল তোলার বরাত। প্রথমে গ্যাসের পরিমাণ ভিত্তিতে দাম ধার্য হল। ইউনিটের নাম 'এম এম বি টি ইউ'। অর্থাৎ ১০০০ ঘন ফুট গ্যাস (দশ লক্ষ ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট)। গ্যাস উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর ক্রয় বিক্রয় চুক্তি হল ২০০২ সালে। দাম ধার্য হল ইউনিট পিছু ২.৩৪ ডলার (৫০ টাকা ডলার হিসেবে ১১৭ টাকা)। রিলায়েন্স ওই দামে গ্যাস বিক্রয় করবে।

Reliance তখনই একটা বিরাট Profit মার্জিনে এই বরাত পায়। তখন ওমান থেকে ভারত গ্যাস কিনছে ০.৯ ডলার বা ৪৫ টাকা দরে। কানাডায় তখন ইউনিট পিছু ৮৭ টাকা দরে গ্যাস বিক্রি করে। রিলায়েন্স দয়া করে ভারতের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা সার উৎপাদন শিল্পে গ্যাস বেচবেন ১১৭ টাকা দরে।

২০০৪-এ ক্ষমতায় এলেন কংগ্রেস। আম্বানির দাস বদল হল। নতুন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মণিশঙ্কর আয়ারের ওপর দাম বাড়ানোর চাপ দিল আম্বানি। তিনি রাজি হলেন না। ফলে হল মন্ত্রী বদল। এলেন মুরলি দেওরা। ২০০৬-এ হল নতুন গ্যাস চুক্তি। ইউনিট প্রতি দাম বাড়ল ১১৭ থেকে ২১০— ২.৩৪ ডলার থেকে ৪.২ ডলার। আম্বানিরা সুযোগ শুধু এইটুকু নিল না। প্রথম চুক্তি মত প্রতি দিন যত পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করার দায় নিয়েছিল, তাও কমিয়ে ফেলল তারা। আবার পুরনো দরে অর্থাৎ ইউনিট পিছু ১১৭র দরে ১৭ বছর ধরে যাদের গ্যাস বিক্রি করবে বলে আম্বানিরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল তাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে মাত্র তিন বছর পরে ২০০৭ সালে তাদেরও নতুন দামে অর্থাৎ ২১০ টাকা দরে গ্যাস কিনতে বাধ্য করল। সরকারও চুক্তির শর্তভঙ্গে সহায়তা দিল।

এরপর ২০০৯-এ পুনর্নির্বাচিত ইউপিএ সরকারের সঙ্গে নতুন চুক্তি করে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ওই ২১০ টাকা দরে গ্যাসে বিক্রি করবে বলে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হল। কিন্তু না অতদিন এক দরে বেচা আর পোষাবে না। তাই ২০১২-তে আব্দার করল গ্যাসের বিক্রয় মূল্য হবে ১৪.২ ডলার বা ৭১০ টাকা। (এখন ৬০ টাকা ডলার)। মন্ত্রী জয়পাল রেড্ডি রাজী হলেন না। ছোট্ট ভৃত্য এবার বড় ভৃত্য দ্বারা অপসারিত হলেন। মন্ত্রী হলেন বীরাপ্পা মইলি। জয়পাল দপ্তরে একটা note রেখে গিয়েছেন। বলা হয়েছে চুক্তিবদ্ধ মেয়াদকাল ২০১৪-র আগে ২০১২ থেকেই এই নতুন হারে দাম পেলে আম্বানির লাভ হবে ৪৩০০০ কোটি টাকা।

সেই সুযোগই পেয়েছেন এই আম্বানি বাবু। বীরাপ্পা মইলি তাঁর দেওয়া এই নতুন দর মেনে নিয়েছেন।

সুতরাং, ভারতের CSR বিধিকে এঁরা যে কতটা মান্যতা দেবেন তা তো বোঝাই যায়। স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত সঠিকভাবেই Dr. Aaroson সরকারের যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টাকে মূল্যই দেননি। তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন Civil Society-র প্রচেষ্টাকে। উদাহরণ হিসেবে এনেছেন

ইংল্যান্ডের ছাত্র সমাজের আন্দোলনকে যেখানে তারা গুগ্‌ল্‌ জাতীয় বিদেশী সংস্থার ট্যাক্স এড়ানোর প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করতে পারছেন।

কিন্তু ভারত তো আর ইংল্যান্ড নয়। এখানকার সিভিল সোসাইটিকেও ওই টাটা আম্বানিরাই চালায়। বুলফাইটের ময়দানে লাল কাপড়টা যে দিকে ধরা হয় ষাঁড়টা যেমন সেটাকেই গুঁতো মারতে যায় তেমনি আমাদের দেশের নাগরিক সমাজের সামনে যেমন যে ইস্যুটাকে মিডিয়া তুলে ধরবে নাগরিক সমাজ নামক ষাঁড়টা সেটাতেই গুঁতো মারতে দৌড়বে। যেমন এখন ধর্ষণ ইস্যুটা তুলে ধরা হয়েছে। কয়েকটা বীভৎস ধর্ষণ ঘটিয়ে দিলে নাগরিক সমাজ তাই নিয়ে লাফাতে থাকবে সেই ফাঁকে কয়লা কেলেঙ্কারি থেকে গ্যাস তেলের দাম বাড়ানোর মত কাজটা সেরে ফেলা যাবে।

অতএব Dr. Aaronson-এর প্রত্যাশা মত সিভিল সোসাইটির চাপ পড়বে না ওই CSR এড়ানো সংস্থাগুলোর ওপর। তাঁরা অবাধে তাঁদের মুনাফার ফসল বাড়িয়ে চলতেই পারবেন। আম্বানি তাই মাসিক পনের লক্ষ টাকা দিয়ে সরকারি VIP নিরাপত্তা কিনতে পারেন এবং আবার নতুন করে গ্যাসের বিক্রয়মূল্য বাড়াতে পারেন, যা ছজন কেন্দ্রিয় মন্ত্রীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সম্প্রতি মনমোহন মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হল। একলাফে ডবল— ৪.২ ডলার থেকে ৮.৪ ডলার প্রতি ইউনিট পিছু ওঁদের দিতে হবে আগামী বছরের এপ্রিল থেকে।

অরুন্ধতী রায় তাই সঠিক ভাবেই বলেছেন, "India's new mega corporations – Tatas, Jindals, Essar, Reliance, Sterlite – are those who have managed to muscle their way to the head of the spigot that is spewing money extracted from deep inside the earth. It's a dream come true for businessmen – to be able to sell what they don't have to buy."

এইখানেই রয়েছে জঙ্গলে ঘেরা পার্বত্য মধ্যভারতের আদিবাসী জীবনের সংকট রহস্য ও মাওবাদী সমস্যার উৎসমুখ। ❑